এ কী দুর্দৈব!

উপদেষ্টাদের গুচ্ছ প্রস্তাব

মনজুরে মওলা

অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিরোধীদলীয় নেতার নেতৃত্বে চৌদ্দ দল ও আরও কিছু কিছু দল আগামী সাধারণ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যে আন্দোলন করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা ওই দলসমূহের নেতৃবৃন্দের কাছে এবং একই সঙ্গে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের নেতৃবৃন্দের কাছে একটি গুচ্ছ প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এই গুচ্ছে তিনটি প্রস্তাব আছে : এক. দু'জন বিতর্কিত নির্বাচন কমিশনারকে ছুটিতে পাঠিয়ে আরও একজন নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ; দুই. ভোটার তালিকা সংশোধন ও নির্বাচন তফসিল পুনর্নির্ধারণ; এবং তিন. কয়েকজন সচিবকে বদলি করা ('জনকণ্ঠ', ০৪-১২-২০০৬)।

এই শেষের প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করার জন্য ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যে-সব সরকারী কর্মকর্তার ভূমিকা সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দলের আপত্তি আছে, তাঁদের এমন পদে বহাল না রাখাই নীতি হিসেবে ভাল, যে-পদে থাকলে তাঁদের কাজের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রভাবান্বিত হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয়, এ সব পদ থেকে অপসারিত কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। প্রথমে বলা হয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। তারপরও বলা হয়, তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন। সবশেষে জানা যায়, তাঁকে উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা দিয়ে একটি সংস্থার প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে। কেন? আমি মনে করি, কোন কর্মকর্তাকে নিয়ে কোন বিতর্ক থাকলে তাঁকে কেবল তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেয়াই যথেষ্ট নয়, তাঁর তথাকথিত বিতর্কিত ভূমিকা সম্পর্কে সরকার যে সচেতন, তা-ও প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজন। এটি যদি প্রদর্শিত না হয়, তাহলে সরকারের নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় না।

সচিব পর্যায়ের পদে রদবদলের মধ্য দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনভিপ্রেতভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া হয়ত কিছুটা রোধ করা যেতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সরাসরি ও মুখ্য ভূমিকা পালন করেন সচিবরা নন, বহিরাঙ্গন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, বিশেষ করে জেলা প্রশাসকরা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা। এই সব পদে এখন যাঁরা কাজ করছেন, বলা হয়ে থাকে, তাঁদের কেউ কেউ, হয়ত বা বেশির ভাগই দলীয় বিবেচনায় এই সব পদের দায়িত্ব পেয়েছেন এবং তাঁদের নিরপেক্ষতা তর্কাতীত নয়। তাঁরা আসলেই দলীয় কিনা, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য হাতে যে সময় আছে, সে সময়ের মধ্যে তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু কারও যদি দলীয় ভাবমূর্তি থাকে, তাহলে তাঁকে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোন দায়িত্ব দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশাসন যে নিরপেক্ষ, এটি দেশের মানুষের কাছে প্রতীয়মান করার জন্যই এ ধরনের কর্মকর্তাদের তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন। এমন কোন উদ্যোগ কি নেয়া হয়েছে? হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। অব্যবহিত পূর্ববর্তী সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় পদোন্নতি দেয়া হয়নি, এমন বহু কর্মকর্তাকে সম্প্রতি পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি, বহিরাঙ্গন পর্যায়ে এখন যে সব কর্মকর্তা কাজ করছেন, তাঁদের পরিবর্তে এসব সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবিলম্বে দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন।

নির্বাচন তফসিল ইতোমধ্যেই পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোট গ্রহণের তারিখ স্থির হয়েছে একুশে জানুয়ারির বদলে তেইশে জানুয়ারি। এই দিনটি নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠে গেছে। তার কারণ, ওই দিন সরস্বতী পুজো। সরস্বতী পুজোর দিন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ কি অনবধানবশত নির্ধারণ করা হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তাহলে নির্বাচন কমিশনকে দক্ষ মনে করার কারণ থাকে না। ভোট গ্রহণের তারিখটি ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু দেশের বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করা অনবধানবশত না হওয়াও অসম্ভব নয়। ওই দিন যদি ওই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারণে ভোট দিতে যেতে না পারেন, তাহলে নির্বাচনে কিছু কিছু বিশেষ রাজনৈতিক দলের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং অন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের লাভবান হবার সম্ভাবনা থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ তারিখটি অবশ্যই পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ইতোমধ্যে যে সময়টুকু পার হয়ে গেছে, তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য চৌদ্দ দল ও তার সহযোগী দলসমূহের পক্ষ থেকে সাধারণ নির্বাচন এই সময়টুকুর সমপরিমাণ সময় পিছিয়ে দেয়ার দাবি উঠেছে। সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদে বলা আছে, সংসদের মেয়াদ শেষ হবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই বিধানের কোন ব্যতিক্রমের কথা সংবিধানে বলা নেই। সুতরাং নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ওই নব্বই দিনের পরে নিয়ে যাওয়ার কোন সাংবিধানিক উপায় খোলা নেই। কিন্তু সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠান করা বেশি জরুরী, নাকি, নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হয়, তা নিশ্চিত করা বেশি জরুরী? দ্বিতীয়টি যদি করতে হয়, তাহলে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর আছে বলে মনে হয় না। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করায় তিনি সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে তিনি আবার প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যান। এই সব ব্যবস্থা সংবিধানসম্মত ছিল না। কিন্তু যেহেতু সব রাজনৈতিক দল এই ব্যবস্থা গ্রহণে একমত হয়েছিল, সেহেতু এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। পরে সংবিধান সংশোধন করে এ ব্যবস্থাকে বৈধতা দেয়া হয়। নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার স্বার্থে আবারও কি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভবপর নয়?

বর্তমান ভোটার তালিকায় এক কোটি বিশ লাখ, বা তারও বেশি ভুয়া ভোটারের নাম আছে বলে একটি বিদেশী সংস্থার জরিপে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে পৃথিবীর সব চাইতে পরাক্রান্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত এই সব 'ত্রুটিপূর্ণ, ভুয়া ও দ্বৈত ভোটার বাদ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন' ('জনকণ্ঠ', ০৪-১২-২০০৬)। ভোটার তালিকা সংশোধন করার কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু তা 'দায়সারা'ভাবে করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ('জনকণ্ঠ', ০৯-১২-২০০৬)। একই পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মকর্তারা 'সম্পূরক ভোটার তালিকার কপি সঙ্কটেও ভুগেছেন'। বিদ্যমান ভোটার তালিকা অবশ্যই যথাযথভাবে সংশোধন করতে হবে এবং তা করার জন্য যেটুকু সময় প্রয়োজন, তা দিতে হবে।

এই লেখা লিখিত হওয়া পর্যন্ত (শনিবার, ০৯-১২-২০০৬, রাত) কোন নির্বাচন কমিশনার ছুটিতে গেছেন বলে আমার জানা নেই। প্রাক্তন বিরোধীদলীয় নেতা বলেছেন, উপদেষ্টারা যে গুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন, তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে হবে। উপদেষ্টারা যদি তাঁদের দেয়া প্রস্তাব বাস্তবায়নই না করতে পারেন, তাহলে সে রকম প্রস্তাব তাঁরা দিতে যান কেন?

১০.১২.০৬

[লেখক কবি, কলামিস্ট ও সাবেক সচিব]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও মিত্রদের অবদান

শাহরিয়ার কবির

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র নয় মাস। নয় মাসের এই যুদ্ধে বাঙালী জাতিকে চরমতম ত্যাগ, দুঃখ, দুর্দশা ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এই নয় মাসে বাংলাদেশে যে গণহত্যাযজ্ঞ ও নারী নির্যাতন হয়েছে স্মরণকালের ইতিহাসে তার নজির নেই। এর পাশাপাশি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকেও স্বীকার করতে হয়েছে চরম পরাজয়। পর্যাপ্ত রসদ ও অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৯২ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের এ দেশীয় দোসরদের আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়েছে এক অভূতপূর্ব বিজয়, বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের, জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেছে বাঙালী।

'৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র নয় মাস স্থায়ী এই মুক্তিযুদ্ধে এত দ্রুত বিজয় অর্জন কখনও সম্ভব ছিল না যদি না ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের পাশে থাকত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং ভারতের পাশে ছিল নেপাল ও ভুটানের মতো প্রতিবেশীরা। এই ক'টি দেশ ছাড়া আমেরিকা, চীন ও পশ্চিম ইউরোপসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকার পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পক্ষে অথবা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের অন্তিমপর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশে একটানা সফর করে সে সব দেশকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নমনীয় করার ক্ষেত্রে অসাধারণ কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের মেয়াদ নয় মাসের হলেও বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রামের সূচনা ঘটেছে '৪৮-এর ভাষা আন্দোলন থেকে। '৪৮-এ সূচিত ভাষা আন্দোলন এবং '৫৪-র নির্বাচনে পাকিস্তান অর্জনকারী মুসলিম লীগের ভরাডুবির ভেতর ধ্বনিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট এই কৃত্রিম রাষ্ট্রের মৃত্যুঘণ্টা। '৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে পারে না। ষাটের দশকের শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোগীকে নিয়ে গোপনে গঠন করেছিলেন 'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' এবং প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন স্বাধীনতার। তাঁর ছয় দফা এমনভাবে প্রণীত হয়েছিল যাতে বাঙালিত্বের বোধ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের ভেতর জাগ্রত করা যায়।

বাংলাদেশকে যাঁরা স্বাধীন করতে চেয়েছেন তাঁরা জানতেন ভারতের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের শাসকরাও এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল। যে কারণে '৪৮-'৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রাম ও জনগণের অভ্যুত্থানকে তারা পাকিস্তানকে দুর্বল করা এবং ভাঙ্গার ভারতীয় ষড়যন্ত্র এবং কমিউনিস্টদের চক্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে আরম্ভ করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের নায়করা এবং '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধারা সকলেই ছিলেন তাদের কাছে 'ভারতের চর'।

যে ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টারা এবং স্বাধীনতার প্রধান শত্রু পাকিস্তানী শাসকরা অভিন্ন দৃষ্টি পোষণ করেছেন, যে ভারত '৭১-এ বাংলাদেশের এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, মুক্তিবাহিনীকে সব রকম সহযোগিতা প্রদান করেছে, সেই ভারত সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতারা এবং গণমাধ্যমসমূহ দেশবাসীকে বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মকে এক রকম অন্ধকারেই রেখেছেন।

কয়েক বছর আগে আমাদের টেলিভিশনে ধাঁধার অনুষ্ঠানে এক বালককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একাত্তর সালে বাংলাদেশের সঙ্গে কোন্ দেশের যুদ্ধ হয়েছিল? বালক জবাব দিয়েছে– 'একাত্তর সালে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হয়েছে।' বারো বছরের এই বালকের উত্তরে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। পঁচাত্তরের পর থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অতি সামান্যই জানানো হচ্ছে। বেতার-টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয় এভাবে– একাত্তরে আমরা এক কল্পিত হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলাম। এ লড়াইয়ে এক কল্পিত মিত্রবাহিনী আমাদের সহযোগিতা করেছিল। কখনও এটা স্পষ্ট করে বলা হয় না হানাদার কে আর মিত্র কে। গত ৩৫ বছর ধরে বিভিন্ন ঘটনাপরম্পরায় এটাই বোঝানো হচ্ছে– পাকিস্তান আমাদের বন্ধু আর ভারত আমাদের শত্রু। এ থেকে বর্তমান প্রজন্মের কোন বালক এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই পারে– একাত্তরে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হয়েছিল।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়েছিল এ কথা যেমন সত্য, একইভাবে এ কথাও সত্য যে, বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তান পরাজিত হলেও তাদের ভাবধারার অনুসারী ব্যক্তি এ দেশে কম ছিল না যারা এই পরাজয় মেনে নেয়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী প্রভৃতি দলের প্রায় ৩৭ হাজার নেতা ও কর্মীকে দালালীর অভিযোগে গ্রেফতার করা হলেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগে এদের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তখন থেকেই এরা পাকিস্তানের পক্ষে এবং ভারতের বিপক্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণায় লিপ্ত হয়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগেও এদের প্রতিনিধি ছিল। উগ্র বামদের কারও কারও বক্তব্যও এদের মতো ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন। অধিকাংশ লেখাই লেখকের নিজস্ব মতাদর্শের আলোকে রচিত হয়েছে, যা মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়ে ওঠেনি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরা যতটা আগ্রহী, প্রকৃত ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে খুব কমই আগ্রহ

দেখিয়েছেন। এসব গ্রন্থে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরতার বিবরণ আছে, মুক্তিবাহিনীর সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ আছে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় দালালদের কার্যকলাপের কথাও আছে, কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদানের কথা সর্বত্র দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনুল্লেখিত থেকেছে। এর ঠিক বিপরীত চিত্র পাওয়া যাবে ভারতে। সেখানে অধিকাংশ লেখকের রচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটি যথাযথভাবে আসেনি। কোন কোন ভারতীয় লেখক বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে মনে করেন একাত্তরের পাক-ভারত যুদ্ধের ফসল। অথচ এই দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই একদেশদর্শী এবং সাম্প্রদায়িকতা ও জাত্যভিমানপ্রসূত।

ভারতের ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ না করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস কখনও লেখা যাবে না। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গত ৩৫ বছরে এ বিষয়ে ভারত বা বাংলাদেশে প্রামাণ্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও ভারতের সামরিক সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, কোথাও রাজনৈতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে, কোথাওবা এই সহযোগিতার পেছনে ভারতের নানাবিধ দুরভিসন্ধি আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ভারতের সাহায্যের সামগ্রিক দিক কখনও আলোচিত হয়নি। না হওয়ার কারণ সরকারের ভারতবিদ্বেষী মনোভাব এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর একটি বড় অংশের সাম্প্রদায়িক মনোভাব। সাতচল্লিশের পর থেকে আমলা ও সামরিক বাহিনীকে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে মৌলবাদী ভাবধারায়, সাম্প্রদায়িক চেতনা তাদের চেতনায় বহু দূর অবধি শেকড় বিস্তার করেছে। যে কারণে সামরিক বাহিনীর অনেক সদস্য এবং সরকারী আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে ঘটনাচক্রে মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হলেও তাদের চেতনা থেকে পাকিস্তানী ভাবধারা নয় মাস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরও দূর হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তাঁরা ভারতীয় সাহায্যের ভেতর মতলব অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন, আবার সাহায্য অপর্যাপ্ত হলে কিংবা ভারত স্বীকৃতি দিতে কেন বিলম্ব করছে–এ নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন এবং স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে ভারতবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। এসব কারণেও মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা অনালোচিত রয়ে গেছে।

২০০৫ সালে সারা ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের হীরকজয়ন্তি উদ্‌যাপন করেছে। এর প্রস্তুতি ২০০৪ সাল থেকেই চলছিল। মিত্রবাহিনীর যোদ্ধাদের সারা পৃথিবী থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তাঁদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে সাড়ম্বরে, টেলিভিশনে তাঁদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি ষাট বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সাফল্যের প্রামাণ্য চিত্রসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে। ষাট বছর পরও মিত্রবাহিনীর বীরযোদ্ধা এবং নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট বাহিনীকবলিত পূর্ব-পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো।

২০০১-এর অক্টোবর থেকে ২০০৬-এর অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে ক্ষমতায় ছিল চারদলীয় জোট, যে জোটের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামী। বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় গিয়ে '৭১-এর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর প্রধান সহযোগী, ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের দল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার বিরুদ্ধে এক ধরনের জেহাদ ঘোষণা করেছিল। যা কিছু মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবই ধ্বংস করতে চেয়েছে জামায়াত-বিএনপির জোট সরকার। জামায়াতের জন্মশত্রু হচ্ছে ভারত। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সার্বিক সহযোগিতার "অপরাধে" জামায়াত সব সময় ভারতকে প্রধান শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে। বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার স্কুল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেখানে সম্ভব হয়েছে বাদ দিয়েছে, সম্ভব না হলে ইতিহাস বিকৃত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যেখানে উল্লেখ ছিল 'পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী' সেখান থেকে 'পাকস্তানী' শব্দটি তারা বাদ দিয়েছে। সেখানে উল্লেখ ছিল 'ভারতীয় মিত্রবাহিনী' সেখান থেকে 'ভারতীয়' শব্দটি বাদ দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী উম্মার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানকে সব সময় বাংলাদেশের পরম বন্ধু এবং ভারতকে চরম শত্রু হিসেবে প্রচার করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এহেন বিকৃতি, ইতিহাস অবমাননা কিংবা বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির পাকিস্তানীকরণ আরম্ভ হয়েছে '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায়।স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল মাত্র দু'বার, যে দলের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল বাঙালীর চার হাজার বছরের ইতিহাসের মহত্তম অর্জন–বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় থাকাকালে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনার ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক ছিল না।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তি উদ্‌যাপন করার জন্য তখন সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী নিয়েছিল। সরকারী বা বেসরকারী কোন উদ্যোগের ভেতর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে যে দুটি দেশ সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে, যাদের সাহায্য ছাড়া বিজয় অর্জন ছিল সুদূরপরাহত, তাদের অবদান স্মরণ করার কোন কর্মসূচী স্থান পায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যে সব সদস্য শহীদ হয়েছেন তাঁদের অবদানও গত ৩৫ বছরে সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের এডমিরাল জুয়েঙ্কো– যিনি যুদ্ধের পর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন সরাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে অকালে অবসর নিয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। সাহায্যের জন্য অন্তিম সময়ে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। আমাদের কোন সরকার এসব বীরের জন্য কিছু করেনি। মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ডব্লিউওএস ওডারল্যান্ড, যাঁকে বীরপ্রতীক খেতাবও দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ তাঁকেও ভুলে গেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্যের প্রধান বিবেচনা ছিল রাজনৈতিক। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন ভারত তার জন্মশত্রু পাকিস্তানকে দু'পাশে রেখে প্রথম থেকেই খুবই অস্বস্তিতে ছিল। কারণ দুই সীমান্তে প্রতিরক্ষার জন্য ভারতকে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছিল। যখন পাকিস্তানকে ভাঙ্গার সুযোগ পাওয়া গেছে ভারত সঙ্গে সঙ্গে তা লুফে নিয়েছে। পাকিস্তানী গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতো এ ধরনের মত বাংলাদেশের একাধিক লেখকও পোষণ করেন। বিশেষ করে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই পাকিস্তানকে অখণ্ড দেখতে চেয়েছেন। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সরদার আবদুল কাইয়ুম খান ৭ জানুয়ারি '৯৬ তারিখে ভারতের এক বেসরকারী টেলিভিশন নেটওয়ার্কে সাক্ষাতকার দিতে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে ভারতের সৃষ্টি। *(চলবে)*

[লেখক সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী]

পূজার দিনে নির্বাচন

ড. সৌমিত্র শেখর

ভোটের দিন, বিশেষ করে সংসদ নির্বাচনের ভোটের দিন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। অন্যদিকে, পূজার দিন ধর্মীয় উৎসব। এই দুই উৎসবের দিন এক হতে পারে না। হলে কোন এক উৎসবের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ন হবেই। এটা আমাদের কাম্য নয়। সম্প্রতি নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নতুন সিডিউল ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন সিডিউল অনুযায়ী আগামী নির্বাচন ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবার কথা। মনোনয়নপত্র উপস্থাপনের শেষ তারিখ ধার্য করা হয়েছে ২১ ডিসেম্বর, বাছাই হবে ২২ ডিসেম্বর আর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর। গত ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের এক সভায় তাদের পূর্বে ঘোষিত সিডিউল বাতিল করে এই নতুন সিডিউল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক আছে। এ নিয়ে নানা আন্দোলন চলেছে এবং চলছে। তাঁদের এ সিদ্ধান্ত নতুন এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কেননা, কমিশন সরস্বতী পূজার দিন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পর্ব ও অনুষ্ঠানাদির আধিক্য থাকলেও তা পূর্বনির্ধারিত এবং পঞ্জিকায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখকৃত। বারো মাসের তেরো পার্বণের কোনটিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা দ্বিধা বা বিভ্রান্তিতে কখনও পড়েনি। অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নিয়ে বিতর্কে জড়ানোর প্রয়োজনও পড়েনি। বহুরাধিককাল আগেই তিথি-নক্ষত্র গণনা করে, সূর্য-চন্দ্রের আবর্তন-বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নানা অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে একই দিনে দুই অনুষ্ঠানও হয়। যেমন, ২০০৫ সালের দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী একই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে কোন মতান্তর সৃষ্টি হয়নি, কোন বিতর্ক বা বিরোধও বাঁধেনি। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পূজা বা ধর্মীয় উৎসবের দিনক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অনেকটাই সহজ। এবারের সরস্বতী পূজার দিনও পঞ্জিকায় নির্ধারিত হয়েছে বছরারম্ভেই। কমিশন বলতে পারে, নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের সময় তারা কি হিন্দুদের পুঁথি-পঞ্জিকা নিয়ে বসবেন? না, আমরা তা বলছি না। কিন্তু আপনারা তো দেশের সরকারী ছুটির তালিকা নিয়ে বসবেন। মাত্র কয়েকদিন আগেই ২০০৭ সালের সরকারী ছুটির অনুমোদিত তালিকাসহ ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়। সেই ক্যালেন্ডারে ৭ নবেম্বর সরকারী ছুটি হিসাবে দেখানো নিয়ে তর্কবিতর্কও চলে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেখানে ২০০৭ সালের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে সজাগ ও আলোচনারত সেখানে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সময় তা সামনে রাখেননি এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। ২০০৭ সালের অনুমোদিত সরকারী ছুটির তালিকায় ২৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ঐচ্ছিক ছুটি রয়েছে। অতএব, বিষয়টি পরিষ্কার, কমিশন জেনেবুঝেই সরস্বতী পূজার দিন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। নির্বাচন কমিশনের এই তারিখ নির্ধারণের অগ্র-পশ্চাৎ একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশে সরকারী হিসাবে ১০% মানুষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু। ব্রিটিশ আমলে এর হার ছিল প্রায় ৪০%। যদিও মুসলিম ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের পরিবারপিছু জন্মহার বৃদ্ধি খুব কমবেশি নয়, তবু গত পঞ্চাশ বছরে এ দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা ও হার কমেছে। রাজনৈতিক কোন সরকারই এ কমে যাওয়াটা স্বীকার করতে চায় না। মনে মনে বাস্তবতাটা মানেন। না মেনে উপায় নেই। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এ ক্রমক্ষীয়মানতাকালে এখনও বাংলাদেশের সাধারণ স্কুল ও কলেজে সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে। অনেকে বলবেন, এমনকি নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের অনেকেই বলবেন, সব স্কুল-কলেজে হয় না। ঠিক। আমি বলব, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো এখন জাতীয় সঙ্গীতও গাওয়া হয় না। উঠে গেছে। আমরা শিশু ও কিশোরকালে স্কুলে গলা ছেড়ে 'আমার সোনার বাংলা' গেয়েছি। এখন স্বাধীন বাংলাদেশের শিশু-কিশোররা জাতীয় সঙ্গীতের চার লাইনও গাইতে পারবে না। তাই বলে কি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেয়া হবে না? একইভাবে, দেশের সব স্কুল-কলেজে সরস্বতী পূজা না হোক, বা কোন কোন প্রতিষ্ঠানে উঠে যাক, এখনও বাংলাদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে। এজন্য বছরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ টাকাও নিয়ে থাকে। স্কুল-কলেজে বার্ষিক ভর্তিকালে মিলাদ ও সরস্বতী পূজার জন্য মুসলিম ও হিন্দু শিক্ষার্থীরা এ চাঁদা প্রদান করে। অতএব, পূজার দিন নির্বিঘ্নে সরস্বতী পূজা করার পরিবেশ সৃষ্টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের অংশও। কিন্তু ওইদিন যদি ভোট হয় এবং কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারিত হয় সেই স্কুল বা কলেজ, তাহলে কর্তৃপক্ষ এবং পূজারীরা বিড়ম্বনায় পড়তে বাধ্য! নির্বাচনের দিন আন্তঃদলীয় কোলাহল বা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে। কোন স্কুল বা কলেজ ক্যাম্পাসে যদি পূজা ও ভোট একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে উদ্দেশ্যবাদীরা পূজামণ্ডপে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে উদ্দেশ্যসাধনে অপতৎপরতা দেখাতে পারে। আর এক স্থানের প্রভাব খুবই দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্যত্র। এই মোবাইল ফোন বা ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার যুগে এক স্থানের সমস্যা অন্য স্থানে নিশ্চিত প্রভাব ফেলবে। নির্বাচন কমিশনারদের যে বয়স, তাতে আমি নিশ্চিত, তাঁরা প্রতেকে নিজ নিজ স্কুল-কলেজে সরস্বতী পূজা দেখেছেন। কারণ, তাদের স্কুলে বা কলেজে অধ্যয়নের সময় দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম ছিল, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ঘনত্ব ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশি ছিল এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সরস্বতী পূজা হতো। তাই বাঙালী সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবনে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে তারা জ্ঞাত। আমার মনে পড়ছে, ছুটিতে যাওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এমএ আজিজ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে চমৎকারভাবে বলেছিলেন : 'সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি/সীতা ছাড়া আমি যেন মণিহারা ফণী।' নির্বাচন করাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, যেমন রামের ধ্যান-জ্ঞান ছিল সীতা। কবির ভাষায় মি. আজিজ নিজেকে রামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অর্থাৎ ওই বয়সের লেখাপড়া জানা মানুষ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মিথ, পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে কম-বেশি জ্ঞাত এ কথা নিশ্চিত। সরস্বতী পূজার দিন ভোরে বিশেষভাবে স্নান সমাপন করে শিক্ষার্থীরা দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের জন্য উপবাসসহ অধীর প্রতীক্ষা করতে থাকে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, পবিত্রতার দেবী সরস্বতী। এ পূজার দিন বাড়ির মা-বোনেরা পূজা উপকরণের আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে। সারাদিন প্রার্থনা, পূজা, ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত হয়। পরদিন দেবীর পাদপদ্মে পুস্তক ও লেখনী স্পর্শ করিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পুনরায় লেখাপড়া সূচনা করে নতুন উদ্যমে। কোন কোন বাড়িতে এই পূজার দিন ভোগরাগ হয়। বাড়ির পুরুষ সদস্যরাও ব্যস্ত থাকেন এর আয়োজনে। ফলে সরস্বতী পূজার দিন নির্বাচন হলে নিশ্চিত বলা যায়, হিন্দুধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী (যারা ভোটার) এবং মহিলাদের ব্যাপক অংশ ভোট দিতে কেন্দ্রে আসবেন না।

বাড়িতে পূজা রেখে আসা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ নিশ্চয়ই ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন হলো, এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেও নির্বাচন কমিশন কেন সরস্বতী পূজার দিন ভোটের তারিখ নির্ধারণ করল? এই একটি কথা যদি মনে রাখা যায় : ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুরা ইসলামী দলগুলোকে ভোট দেয় না (তারা অবশ্য হিন্দুদের ভোট চায়ও না); বিএনপির পক্ষেও ভোটদানের শতকরা হার সামান্য; ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভোট ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কথা বলা আওয়ামী লীগই প্রায় নিরঙ্কুশভাবে পেয়ে থাকে। এঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিয়ে ঘরে ব্যস্ত রাখতে পারলে অন্তত ৫% ভোট নিশ্চিতভাবে আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থীরা কম পাবে। এই সরল হিসাবটুকু মনে রাখলেই পূজার দিন ভোটের তারিখ নির্ধারণের অঙ্কটি বোঝা যাবে। আর ওইদিন নানা স্থানে প্রতিমা স্থাপিত থাকবে। যতই সেনা বা র‍্যাব বাহিনী থাকুক না কেন, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিমায় আঘাত করার নির্দিষ্ট ক্ষণটুকু বের করা দুষ্ট লোকদের জন্য কষ্টকর হবে না। আর এতে যে আতঙ্ক ও ভয়ভীতির সঞ্চার করা যাবে, তাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইবেন অনেক গণশত্রু।

পূজার দিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আরেকটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে ভবিষ্যতে সহজ হবে এবং তা হলো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর যে কোন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার কাজ। সরস্বতী পূজার দিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এটি হবে একটি অন্যরকম উদাহরণ। নির্বাচন কমিশন কি এমন উদাহরণ সৃষ্টির জন্যই পূজার দিন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে?

[লেখক সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

একুশের অমর গানের স্রষ্টা

কাইউম পারভেজ

আজ ১২ ডিসেম্বর। আমার প্রিয় লেখক, কলামিস্ট সুকুমার সৃষ্টির নায়ক শ্রদ্ধাভাজন আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর জন্মদিন। তাঁর সাথে আমার সরাসরি পরিচয় মাত্র বছর ছয়েকের। তবে ষাটের দশকে একুশের প্রভাত ফেরিগুলোতে পাকি "ঠোলাদের" লাঠিচার্জ আর টিয়ারশেল খেয়ে যে গানটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে গাইতে গাইতে অলিগলিতে ঢুকে পড়তাম– জেনেছিলাম সে অমর গানের রচয়িতা সাংবাদিক কলামিস্ট আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরও গভীরভাবে পরিচিত হতে থাকলাম তাঁর লেখায়। ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম বলেই কিনা জানি না, তাঁর লেখা পড়লে মনে হতো তিনি যেন আমারই কথা বলছেন। সেই থেকেই তিনি আমার প্রিয় লেখক, আমাদের আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী।

সময় গড়িয়ে চলে। ছাত্রজীবন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, স্বদেশে চাকরিজীবন এবং অবশেষে প্রবাসজীবন। সর্বদাই সঙ্গী করে রেখেছি– আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। দেশের বিভিন্ন সঙ্কটে মন খারাপ হয়েছে। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা পড়েছি– হতাশাকে জয় করার চেষ্টা করেছি।

২০০০ সালের কথা, বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বৈবাহিক সূত্রে পারিবারিক দিক থেকে তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠজন হলেও সর্বদাই তাঁর বাঁশি শুনেছি–চোখে দেখিনি। স্ত্রী কবিতার কাছে যেমন শুনেছি ওদের চাচা ফয়েজ আহমদের কথা; তেমনি শুনেছি গাফ্‌ফার চাচার কথা। চাচির কথা। তাঁদের স্নেহ-আদরের কথা। তো সে বারই প্রথম দেখলাম। আমাদের আতিথ্যেই ছিলেন। ফলে জীবনের জমে থাকা নানান প্রশ্ন, প্রিয়-অপ্রিয় মন্তব্য কিছুই বাদ রাখিনি। তিনিও রেখেঢেকে কিছু বলেননি। কত কথা। দেশের কথা। বঙ্গবন্ধুর কথা। মুক্তিযুদ্ধের কথা। তাঁদের দু'বন্ধু তিনি এবং মরহুম এম আর আখতার মুকুলের কথা। এমনকি তাঁদের ঝগড়া-বিবাদ নিয়েও কথা। সব মিলিয়ে মনে হয়েছে তিনি আমার অনেক দিনের চেনা–অপ্রিয় সত্য যিনি নিঃসঙ্কোচে বলে দেন এবং সত্য এবং বাস্তব ব্যাখ্যা দিতে যিনি ইতস্তত বোধ করেন না। সে কারণে তিনি কখনও আওয়ামী লীগের–আবার কখনও আওয়ামী লীগের নন। কারণ তিনি আওয়ামী লীগার নন, তবে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে ভালবাসেন। আর সে কারণে প্রয়োজনে আওয়ামী সমালোচনাও করেন। আর তখনই আওয়ামী ঘরানার মানুষজন তাঁর ওপর বিরক্ত হন।

২০০০ সালে সিডনি এসে তিনি মাতিয়ে গিয়েছিলেন। এটা সত্য, তিনি যেমন মোহাবিষ্ট লেখা লেখেন তেমন করে বলেন না, তবুও ইতিহাসের মাইলস্টোন হয়ে যেভাবে একের পর এক সব বলে গেলেন আমরা সবাই সাতচল্লিশপূর্ব বাংলা থেকে ২০০০ সালের বাংলাদেশকে চোখের সম্মুখে যেন দেখলাম। গেল বছর বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে আমি আবার তাঁকে আমাদের অতিথি করে নিয়ে এলাম সিডনিতে। সঙ্গে বিশেষ অতিথি পারভীন সুলতানা। তবে এবারে একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছিলাম। তাঁর সাড়া জাগানো নাটক পলাশী থেকে ধানমণ্ডি। তিনি বললেন, মঞ্চে করার মতো যথেষ্ট সময় নেই বরং নাটকের সিডি নিয়ে আসব এবং সিডনিতেই এই সিডির প্রথম প্রকাশনা এই অনুষ্ঠানেই। তাই মেনে নিলাম, তবে সে সময়ে লন্ডনে বোমা হামলার কারণে আমাদের অনুষ্ঠান এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিতে হয়েছিল।

এ নাটক নিয়ে যেমন অশ্রু বিসর্জন হয়েছিল তেমনি প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল। কেউ বলেছেন, অতিরঞ্জিত, কেউবা বলেছেন, তথ্য সঠিক নয়। নাটক শেষে এক দর্শক তো আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীকে সে কথা সরাসরি বলেই ফেললেন। আপনার ইতিহাস সত্য নয়। উত্তরে গাফ্‌ফার চৌধুরী বললেন, ইতিহাস কেউ সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু বিকৃত করতে পারে। ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলে। আমি কেবল সেই ইতিহাসকে সবার সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। যদি কেউ মনে করে আমি ভুল ইতিহাস, ভুল তথ্য দিয়েছি তাহলে প্রমাণ করুক কোথায় তথ্য ভুল। আমি আমার নাটকের মূল উপাত্ত নিয়েছি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় এবং নথিপত্র থেকে যেগুলো সরকারী তদন্তেই বেরিয়ে এসেছে। এ ছাড়া ঘটনা এবং ইতিহাসের পাত্রপাত্রী যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের সাথে সরাসরি কথা বলেছি। এ নাটকটি করার জন্য আমি পঁচিশ বছর ধরে পড়াশোনা করেছি। তথ্য সংগ্রহ করেছি। দেশে-

বিদেশে দেশী-বিদেশী লেখক, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক এবং মিডিয়ার মানুষজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ঘটনার বিশ্লেষণ করেছি। তারপর নাটকে হাত দিয়েছি। আরেকজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন–আপনি জিয়াউর রহমানকে এর মধ্যে জড়ালেন কেন? উত্তরে গাফ্ফার চৌধুরী বললেন–জিয়াকে তো আমি জড়াইনি– তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন ইতিহাসের স্রোতধারায়। তিনিও তো বঙ্গবন্ধু হত্যার ইতিহাসের একজন পাত্র। যেমনিভাব খন্দকার মোশতাকও একজন পাত্র। মোশতাক তো আওয়ামী লীগের লোক এবং বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাহলে তাকে কি বাদ দিয়ে আমার এ নাটক তৈরি করা উচিত ছিল? রামকে বাদ দিয়ে কি রামায়ণ লেখা যায়?

এমন স্পষ্টই তাঁর কথাবার্তা। কেউ পছন্দ করেন, কেউ করেন না। এটাই নিয়ম, না হলে তো তিনি ফেরেশতা হয়ে যাবেন। তবু যথাসময়ে যথা কথাটি সাহস করে যুক্তি দিয়ে বলার ক্ষমতা সবার মনে থাকলেও প্রকাশের ঝুঁকি নিতে সবাই পারেন না বা চান না– যেটা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী পারেন। সপ্তাহখানেক আগে তাঁর সাথে টেলিফোনে কথা হলো– বললেন শরীরটা ভাল নেই। আর কতদিন বাঁচব জানি না। শুধু দোয়া কর আমার জীবনের অন্তিম ইচ্ছা বঙ্গবন্ধুর ওপর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটা যেন শেষ করে যেতে পারি। বললাম, দোয়া অবশ্যই করব। আপনাকে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আপনাকে দেখে যেতে হবে। সে লক্ষ্যে আপনার কলম সচল থাকতে হবে। আপনার সাম্প্রতিক লেখার রেশ ধরে বলছি, এবার আমাদের শেষ মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতাবিরোধী এবং তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে যদি এবার হেরে যাই তবে চৌদ্দ দলসহ সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। 'ই' আদ্যক্ষরযুক্ত একজন একাত্তরে নানান রকম আলাপ-আলোচনা আর দূতিয়ালি নাটকের নামে কেবল সময়ক্ষেপণ করে হায়েনা লেলিয়ে দিয়েছিল একাত্তরের পঁচিশে মার্চে আর এবার আর একজন 'ই' সেই পথেই এগুচ্ছেন। সব 'ই' মানেই কি কালক্ষেপণ?

আপনি সম্প্রতি লিখেছেন, বিএনপি-জামায়াত জোটের পাতা ফাঁদে চৌদ্দ দল বারংবার পা দিচ্ছে আর বঙ্গভবনের 'ই' কালক্ষেপণ করে জালিয়াতির নির্বাচনের জয় তাদেরকে সুনিশ্চিত করছেন। আপনার কথামতো যদি নিরপেক্ষ নির্বাচনে চৌদ্দ দল জয়ী হয়ও তবুও ভরসা নেই সেই 'ই' হয়ত ফন্দিফিকির করে অথবা কালক্ষেপণ করে (যাতে তিনি সিদ্ধহস্ত) একটা কিছু ভণ্ডুল করবেন। আমিও আপনার সাথে একমত। তাই আপনার সুরে বলতে চাই–আন্দোলন এখন একটাই–তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান পরিবর্তন করে তবেই নির্বাচন, নয়ত নয়। নইলে কেবল রাজনীতির সাপ-লুডু খেলাই সার হবে।

আমার এক শ্রীলঙ্কান সহকর্মী যিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির খোঁজখবর রাখেন সেদিন আলাপ করেছিলেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ফিজিতে সদ্য ঘটে যাওয়া সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে। বলছিলেন, কমনওয়েলথভুক্ত সব দেশ বলছে, এমনকি এর সেক্রেটারি জেনারেলও বলেছেন– ফিজিতে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় থাকলে তাকে কমনওয়েলথ থেকে বহিষ্কার করা হবে। তোমাদের দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংঘাতের কথাও জানি, তবে আমি প্রশংসা করি তোমাদের সামরিক বাহিনীর। তাঁরা যথেষ্ট প্রজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছে দেশের চলমান রাজনীতির সাথে না জড়িয়ে। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে কাজ করে তাঁদের এখন অনেক সুনাম। খুব ভাল লাগল তাঁর মুখে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রশংসা শুনে।

কথার মোড় ঘুরে গেল। বলছিলাম দেশের দুঃসময়ের লেখক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কথা। মরহুম এম আর আখতার মুকুল মৃত্যুর আগে যখন লন্ডনে চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন মরহুম মুকুলের জন্য তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সেবা আমরা পারিবারিকভাবে চিরদিন স্মরণ করব। তিনি আমাদের বিপদের বন্ধু। আজ তাঁর জন্মদিনে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধাভাজনেষু আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী–আপনার লেখায় প্রায়শই যথোপযুক্ত গল্প উপমা থাকে, যা আপনার লেখাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। আমার এ লেখার শেষপ্রান্তে এসে আমারও একটা গল্প নয়, তবে সত্য ঘটনা মনে হলো। ভাবছি আপনাকে সেটা বলে ফেলি, তবে সেটা প্রাণবন্ত নয়। আমার ছেলেমেয়ে দুটি–আপনি যাদের প্রিয় নানু, ওদের প্রিয় বাংলা ছবি "হীরক রাজার দেশে"। ছোটবেলা থেকে না হলেও পঞ্চাশবার দেখেছে। তারপরও এখনও দেখে। সমস্ত সংলাপ ওদের মুখস্থ। পরীক্ষা শেষে সম্প্রতি ওদের সাথে আবার দেখছিলাম সেই "হীরক রাজার দেশে"। ছবিটা দেখতে দেখতে কখন যে দেশে চলে গিয়েছিলাম বুঝতেই পারিনি। ছবিগুলোর চরিত্রের সাথে দেশের সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলো মেলাচ্ছিলাম–আমাদের বর্তমান হীরক রাজা বা 'ই' রাজা, তাঁর 'হাওয়ায়' অবস্থিত যন্তর মন্তর ঘর, মগজ ধোলাই, ফজল মিয়া, অধুনা ইউনূস মিয়া আরও কত মিয়া। শুধু মনে হচ্ছিল আমরা কি কোনভাবে কোন গুপী বাঘা পেতে পারি না? পরক্ষণেই মনে হলো আরে দশ উপদেষ্টাই তো আমাদের গুপী বাঘা। আমাদের আর কিসের ভয়? এমন আরও অনেক কিছু ভাবছি। সম্বিত ফিরে পেলাম যখন শুনলাম– হীরক রাজার মূর্তির গলায় দড়ি পরিয়ে জনগণ চিৎকার করছে–দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান–দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান। এবং এক সময়ে হীরকের একগুঁয়ে রাজার মূর্তি ধসে পড়ল।

এখনও কানে সর্বদাই বাজে। মনের অজান্তে নিজেই যেন বলে ফেলি–দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান। শ্রদ্ধাভাজনেষু আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী–আপনি কি তেমনি করে বলবেন–দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান। আপনি সুস্থ থাকুন। আপনি শতায়ু হোন।

[লেখক প্রবাসী অধ্যাপক]